

সোহরাব হোসেনের ‘সওকত আলির প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি’ উপন্যাস : সময়, সমাজ ও সংস্কৃতির দলিল
লিসা পারভিন

Link : https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2026/01/22_Lisha-Parvin.pdf

সারসংক্ষেপ: বাংলা কথাসাহিত্যের এক ব্যতিক্রমী ও চিন্তাশীল গল্পকার হলেন সোহরাব হোসেন। তাঁর সাহিত্যজগতে অবদান সমৃদ্ধ ও বহুমাত্রিক। ‘মহারণ’, ‘সরম আলির ভুবন’, ‘মাঠ ও জাদু জানে’— এর মতো অভিনব উপন্যাসের পাশাপাশি তিনি পাঠকদের উপহার দিয়েছেন গভীর মানবিকতা ও বাস্তবতার মিশেলে রচিত অসাধারণ উপন্যাস ‘সওকত আলির প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি’(২০০৯), আলোচ্য উপন্যাসের কাহিনির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন সওকত আলি এবং তাঁর দুই ছেলে — মোস্তাক ও মোজাফফর। উপন্যাসে লেখক তুলে ধরেছেন একই পরিবারের মধ্যে থেকেও প্রত্যেক সদস্যের ব্যক্তিগত স্বপ্ন, দায়বদ্ধতা, সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে নিরন্তর লড়াই — এই উপন্যাসের প্রধান বুনন। সওকত আলি স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাঁর দুই ছেলে সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সমাজে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই তিনি সন্তানদের ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা-ধারায় পাঠান, যাতে তাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ও স্বনির্ভর হয়। কিন্তু বাস্তবতা সেই স্বপ্নকে আর পূরণ হতে দেয় না। দুটি সন্তান দুটি ভিন্ন ধারার শিক্ষা গ্রহণ করলেও, ব্যক্তিগত দুর্বলতা, ভুল সিদ্ধান্ত ও সময়ের প্রতিকূলতায় তারা দু’জনই এসে পৌঁছায় সমস্যার গভীর খাদে। ফলত সওকত আলির স্বপ্ন ভেঙে খান খান হয়ে যায় এবং পুরো পরিবারকেই ভোগ করতে হয় দুঃসহ পরিস্থিতির চাপ। বর্তমান সমাজের প্রতিটি মধ্যবিত্ত পরিবারের মতো সওকত আলির পরিবারেও নিত্যদিনের জীবনযাপনে সুখ-দুঃখ, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, আকাঙ্ক্ষা-হতাশা এবং টানাপোড়েনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। কিন্তু উপন্যাসের পরবর্তী অংশে দেখা যায়, এই সংঘাত ও সমস্যাগুলো কেবলমাত্র পরিবারের চার দেয়ালের ভেতর সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং তা ধীরে ধীরে সমাজ, ধর্ম ও রাজনীতির মতো বৃহত্তর পরিমণ্ডলের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। মানুষের মনোজগতের সংকীর্ণতা, অস্থ বিশ্বাস, সামাজিক অনুশাসন, আর্থিক অনিশ্চয়তা এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার জন্য নীরব যুদ্ধ — সব কিছু মিলিয়ে সৃষ্টি হয়েছে জটিল কিন্তু বাস্তবধর্মী এক পরিমণ্ডল। আলোচ্য লেখায় আমরা মূলত এই পরিবারে ঘটে যাওয়া সেই সংঘাত, বেদনা, ও স্বপ্নভঙ্গের বিষয়গুলিই তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি।

সূচক শব্দ: কথাসাহিত্য, সামাজিক বাস্তবতা, গ্রামীণ জীবন, মুসলিম সমাজ, প্রতিকূলতা।

সোহরাব হোসেন আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে এক বিশিষ্ট নাম। আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে স্বকীয় চিন্তা ও বাস্তবধর্মী উপস্থাপনার মাধ্যমে তিনি এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন। তাঁর রচনার মধ্যদিয়ে যেমন উঠে এসেছে সমাজের প্রান্তিক ও শ্রমজীবী মানুষের জীবনসংগ্রামের বাস্তব চিত্র, তেমনি অন্যপাশে উঠে এসেছে রাজনীতির ঘূর্ণবাহতে পড়ে দুর্বিষহ হয়ে ওঠা সাধারণ মানুষের জীবন যন্ত্রণার ছবি। বাংলার অতি পরিচিত সমাজ জীবনে হিন্দু-মুসলমান দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অবিদ্বন্দ্ব সম্পর্ক ও সংস্কৃতির ছবি। সোহরাব হোসেন শুধুমাত্র একজন সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেননি পাশাপাশি তাঁকে মুসলিম জনজীবনের রূপকারও বলা হয়ে থাকে। একজন মুসলিম পরিবারের সন্তান হওয়ায় তাঁর লেখালেখিতে দৈনন্দিন মুসলিম জীবন যাপনের ছবি নিবিড়ভাবে উঠে এসেছে। তবে তাঁর মুসলিম ভাবনার বিষয়বস্তুটি কোনো সময় সাম্প্রদায়িক ভাবনায় নিয়োজিত হয়নি। ধর্ম সম্পর্কে সোহরাব হোসেনের ভাবনা মানবতাবাদী। সেই প্রসঙ্গে সোহরাব হোসেন এক সাক্ষাৎকারে বলেন — “আমি প্রচলিত ধর্মমতে বিশ্বাস করি না... লেখালেখির জগতে জীবন অনেক বড়ো, সেখানে অনেক দায়বদ্ধতা থাকে মানুষের জন্য সমাজের জন্যে কিছু করার...” এসবের পরেও একজন মুসলিম পরিবারে

জন্মগ্রহণের সুবাদে লেখক সমাজের অন্তর্গত মুসলমান সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা, আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি, ধর্মীয় কুসংস্কার ও লোকাচারকে নিবিড়ভাবে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পান। এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্যচিন্তা ও সৃজনধারার অন্যতম ভিত্তি রূপে কাজ করেছে।

সোহারাব হোসেন সমাজের অন্তর্নিহিত বাস্তবতা, বিশ্বাস, প্রথা আর দ্বন্দ্বকে গভীর দৃষ্টিতে উপলব্ধি করেছেন এবং সেটি তাঁর সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। বাস্তবচেতনারই এক উজ্জ্বল প্রতিফলন লক্ষ করা যায় সোহারাব হোসেনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস ‘সওকত আলির প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি’তে। উপন্যাসে সওকত আলির পরিবারকে এক শালিন ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রতিচ্ছবি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমন আরো বহু সাধারণ পরিবার, কিন্তু সেই পরিবার একদিন সময়ের স্রোতে ক্রমে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে; ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে অবক্ষয়ের অন্ধকার অতলে। ইতিহাসের নির্মম গতিপ্রবাহ গিলে নিয়েছে মোজাফফর ও ইতিকণার নির্মল প্রেমকে। অন্যদিকে ‘মোস্তাক জজি’ তকমা মাথায় নিয়ে প্রশাসনের সন্দেহের জালে আটকে, সেও হারিয়ে গেছে কোথায়, কেউ জানে না। এ যেন আমাদের সময়ের অগণিত সংখ্যালঘু যুবকের অভিন্ন পরিণতি — যারা নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচাতে বাধ্য হয় অদৃশ্য হয়ে যেত। মুসলিম সমাজের এই সংকট আসলে এক বৃহত্তর সামাজিক বাস্তবতার প্রতিফলন। এটি কেবল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সমস্যা নয়, বরং সময়ের গর্ভে জন্ম নেওয়া এক জটিল সামাজিক রূপান্তরের ফল যেখানে লেখক সমাজের অভ্যন্তরের নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাতে চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের শুরু সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে নানা প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তিকে ঘিরে। যার কেন্দ্রে আছে পরিবার, সময়, সমাজ, ধর্ম, দেশ-কাল, সর্বোপরি আছে অশ্বত্ব মনের সংকীর্ণতা। যেগুলি এই উপন্যাসের চরিত্রগুলি বহন করে চলেছে।

‘সওকত আলির প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি’ উপন্যাসের ভূমিকা অংশে সোহারাব হোসেন বলেছেন — “প্রাপ্তির ঘরে অপ্রাপ্তির ওম ধারণ কোরে রেখেছে যারা কিংবা অপ্রাপ্তির ওমে যারা প্রাপ্তির ঘর খোঁজে তারা অচিন মানুষ। সাদা চোখে, কোনও মতেই, তাদের চেনা যায় না বোলেই আমার বিশ্বাস... বর্তমান সময়ের যে মান্যরীতি সেখানে ওপরে-ওপরে আমাদের সমাজকে ধর্ম-বর্ণের মানদণ্ডে ভেঙে দ্যাখা হয়। দেখে মানুষের গায়ে ভুল-ছাপা দেগেও দেওয়া হয়। ফলে অবিশ্বাস, অজানার ভ্রান্তি আর বিভেদের জালে আমরা আটকে পড়ি। আটকে পড়ি বোলে মানুষের বর্নারূপ বা নদীরূপ দেখতে পাইনে। পাইনে বোলে আমরা অর্ধেক মানুষ হয়ে বেঁচে থাকি। প্রাপ্তি নিয়ে মাতামাতি কোরি। অপ্রাপ্তিতে ক্ষুণ্ণ হই। প্রাপ্তির গৃহকে অমর্যাদা কোরি। ধ্বংস কোরে দিই অপ্রাপ্তির ওমকে। দিয়ে নষ্ট হয়ে যাই। দিয়ে বেঁচে থাকার পরিসীমায় ঘূর্ণিঝড় তুলি। বিপন্ন কোরি নিজেদের।”^২

সোহারাব হোসেনের আলোচ্য উপন্যাস ‘সওকত আলির প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি’তে মুসলমান সমাজের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন, প্রজন্মগত দ্বন্দ্ব এবং শিক্ষার ভিন্ন ধারার প্রভাব বাস্তবধর্মীতা চিত্রিত হয়েছে। উপন্যাসটির প্রধান তিনটি চরিত্র হলো — সওকত আলি, এবং তাঁর দুই পুত্র মোজাফফর ও মোস্তাক। কেন্দ্রীয় চরিত্র সওকত আলি একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। জীবনের শেষ পর্বে এসে তাঁর একমাত্র আশা ছিল, তাঁর দুই ছেলে শিক্ষার মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবে। সেই উদ্দেশ্যে তিনি বড়ো ছেলে মোজাফফরকে সাধারণ শিক্ষায় এবং ছোটো ছেলে মোস্তাককে ধর্মীয় শিক্ষায় (মাদ্রাসায়) পাঠান। কিন্তু এই শিক্ষার ভিন্নতা পরিণামে সৃষ্টি করে চিন্তা ও আদর্শগত সংঘাত। মোজাফফর আধুনিক ও যুক্তিবাদী চিন্তাধারার প্রতিনিধি; সে পরিবর্তন ও প্রগতির পক্ষে। অন্যদিকে মোস্তাক রক্ষণশীল ধর্মীয় মূল্যবোধে বিশ্বাসী। ফলত, দুই ভাইয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়, যা প্রকৃতপক্ষে তৎকালীন মুসলমান সমাজে আধুনিকতা ও ধর্মীয়তার সংঘাতের প্রতীক। সওকত আলির প্রাপ্তি মূলত তাঁর শিক্ষাবোধ ও আদর্শের প্রতি দৃঢ়তা। তিনি চেষ্টা করেছেন দুই ধারার শিক্ষার মাধ্যমে সমাজে ভারসাম্য আনতে — একদিকে ধর্ম, অন্যদিকে আধুনিক জ্ঞান। একজন পিতা হিসেবে তিনি সং ও দায়িত্বশীল; তাঁর অভিপ্রায় ছিল সন্তানদের মাধ্যমে সমাজে উন্নতির দিশা দেখানো। তাঁর এই মানবিক চেতনা, শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা ও সমাজসচেতনার দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁর প্রকৃত প্রাপ্তি। কিন্তু বাস্তব জীবনে সওকত আলির সেই স্বপ্ন পূর্ণতা পায় না। দুই

ছেলের মধ্যে মতাদর্শগত বিভাজন ও মানসিক দূরত্ব তৈরি হয়। একদিকে ধর্মান্থতা, অন্যদিকে আধুনিকতায়-পারিবারিক ঐক্য নষ্ট হয়। সমাজ ও পরিবার উভয় স্তরেই তিনি দেখতে পান বিভক্তির ছবি। সম্ভানদের মধ্যকার এই দূরত্ব ও নিজের আদর্শের ব্যর্থতা সওকত আলির জীবনের সবচেয়ে বড়ো অপ্রাপ্তি ‘সওকত আলির প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি’ শুধু একটি পরিবারের গল্প নয়; এটি মুসলমান সমাজের এক সংকটময় মানসিক ও সামাজিক অবস্থার প্রতিচ্ছবি। লেখক এই উপন্যাসের মাধ্যমে দেখিয়েছেন — প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির মধ্য দিয়ে সওকত আলি আসলে এক যুগের প্রতীক, যেখানে প্রাচীন ধর্মীয় মূল্যবোধ ও আধুনিকতার সংঘাত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সোহরাব হোসেনের তাঁর ‘সওকত আলির প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি’ উপন্যাসে সামাজিক সমস্যাগুলিকে এমন সূক্ষ্মভাবে পারিবারিক পরিসরে মিশিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে যে, পরিবারের প্রতিটি সদস্যের ব্যক্তিগত সংকট যেন সময়ের জটিল আবর্তনেরই স্বাভাবিক পরিণতি। হাতে হাতে ইন্টারনেটের যুগে হিংসা, বিদ্বেষ এখন বিশ্ব তথা বাংলা তথা ভারতের ঘরে ঘরে। এবং এসব নিয়ে মানুষ খুব বেশি চিন্তিত নয়। বৃকে বৃকে হিংসা বিদ্বেষ নিয়ে মানুষের সম্পর্কের এই অবনতি এটি কেবল আজকের ঘটনা নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘প্রবাসীতে’ ১৩১৪ সনে লিখেছিলেন — “আমরা এক দেশে এক সুখদুঃখের মধ্যে একত্রে বাস করি, আমরা মানুষ, যদি এক না হই তবে সে লজ্জা, সে অধর্ম।”^৩ এক শতাব্দীরও বেশি সময় পেরিয়ে গেছে কবিগুরুর সেই আক্ষেপের, কিন্তু দুঃখজনকভাবে আজও সেই একই বিভেদের আগুন সমাজকে দগ্ধ করে চলেছে।

সোহরাব হোসেন তাঁর উপন্যাসে এই বিভেদেরই বাস্তব প্রতিফলন দেখিয়েছেন পারিবারিক ও সামাজিক পরিসরে। ‘সওকত আলির প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি’তে ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতির অন্ধ আনুগত্য কীভাবে মানুষকে মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তোলে, লেখক তা গভীর মমতা ও বেদনায় চিত্রিত করেছেন। মোস্তাকের উগ্র ধর্মীয় মনোভাব ও মোজাফফরের উদার মানবিক বোধ — এই দুই বিপরীত চরিত্রের দ্বন্দ্বের মাধ্যমে লেখক দেখিয়েছেন, সমাজে ধর্ম যদি নৈতিকতার চেয়ে বড়ো হয়ে ওঠে, তবে মানবিক ঐক্য নষ্ট হয়। ফলে ব্যক্তিগত জীবনের পাশাপাশি সামাজিক সম্পর্কও ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

সওকত আলি তাঁর দুই পুত্রকে দুটি ভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠালেও, তাঁর মনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল — দুজনেই যেন দুটি ঝর্ণার মতো সমান্তরাল ধারায় প্রবাহিত হয়, নিজেদের স্বকীয় গতি ও মর্যাদা বজায় রেখে জীবনে এগিয়ে যায়। কিন্তু ধীরে ধীরে তার মনে এক ধরনের সংশয় জন্ম নিতে থাকে — মনে হয়, তার এক ঝর্ণা যেন দিকভ্রষ্ট হয়ে ভুল পথে হারিয়ে যাচ্ছে। উপন্যাসের সূচনাংশে দেখা যাই — মোজাফফার একদিন তার কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে বাড়িতে আসে। সেই দিনেই মোজাফফরের সতীর্থ ইতিকণার সঙ্গে তার ছোটো ভাই মোস্তাকের পরিচয় ঘটে। প্রথমে সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনার মধ্য দিয়ে শুরুর হলেও, ধীরে ধীরে মতবিরোধের সূত্র ধরে দুজনের মধ্যে বাগবিতণ্ডা সৃষ্টি হয়। এই বাগবিতণ্ডার সূত্রপাত হয় মোস্তাকের একটি বক্তব্যকে কেন্দ্র করে, যা পরবর্তীতে উপন্যাসের সংঘাত ও চরিত্র বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি তৈরি করে। তার মতে — “আমার বিশ্বাস হিন্দুদের থেকে মুসলিমরা বেশি উদার।”^৪ কিন্তু ইতিকণা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছিল যে মোস্তাকের এই যুক্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। সে দৃঢ় কণ্ঠে বলেছিল, বাস্তবে তেমনটি কখনোই ঘটে না। তবুও মোস্তাক নানা প্রসঙ্গ টেনে এনে নিজের বক্তব্যকে প্রমাণ করার চেষ্টা করছিল। তার মতে, হিন্দুপ্রধান এলাকায় শিক্ষিত মুসলমানরা প্রায়ই বাড়ি ভাড়া পেতে অসুবিধায় পড়ে। একইভাবে, হিন্দু-মুসলমান বিবাহের ক্ষেত্রেও সে মনে করে, মুসলিম পরিবারে হিন্দু ছেলে-মেয়েকে গ্রহণ করার মানসিকতা তুলনামূলকভাবে বেশি, কিন্তু ইতিকণা প্রতিবারই তার এই যুক্তিকে অগ্রাহ্য করে, তার মতে “কখনও কোনও সমগ্র সম্প্রদায় উদার হতে পারে না অনুদারও না। আসলে উদার-অনুদার তো কোনও সম্প্রদায় বেছে হয় না। হয় মানুষভেদে। রুচি-বিশ্বাস-আবহাওয়াভেদে সব সম্প্রদায়ের মধ্যেই ভালোমন্দ উদার-অনুদার থাকে।”^৫ এই ভাবে তাদের মধ্যে নানাভাবে কথার মতবিরোধ তৈরি হয়। এবং একসময় এসে ইতিকণার সঙ্গে যুক্তিতে পেরে না উঠে মোস্তাক ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। আর এই সমস্ত বিষয়ই

প্রথম থেকেই সওকত আলির নজরে এসেছিল। ছোটো ছেলের এমন অপ্রত্যাশিত আচরণ দেখে তিনি গভীরভাবে বিস্মিত হন। তাঁর অন্তর্দৃষ্টি যেন আগেই ইঞ্জিত দিয়েছিল — মোস্তাক হয়তো জীবনের সঠিক পথ থেকে সরে গিয়ে এক ভিন্ন, অনিশ্চিত পথে পা বাড়িয়েছে। মোস্তাকের ব্যবহারে এই উগ্রতা, এত বেশি হিন্দু বিদ্রোহী মনোভাব এগুলি দেখে তিনি অনেকটাই বেশি চিন্তিত হয়ে পড়ে এবং হাতজোড় করে মোস্তাকের ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চান। “রাগ করোনা তোমরা। আমি মোস্তাকের হয়ে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি! বড্ড রাগী আমার ছোট ছেলে।”^৬ ইতিকণার উদ্দেশ্যে বলেন — “ও ঘর থেকে আমি সব শুনছি মা। তুমিই ঠিক! কিছু মনে করোনা!”^৭ আসলে সওকত আলির এই ভাবে ক্ষমা চাওয়ার মধ্য দিয়ে লেখক সমাজের এক বাবার অসহায়তার ছবি তুলে ধরেছেন। যেখানে মোস্তাকের মতো কিছু মানুষ অশ্ববিশ্বাসের বসবর্তী হয়ে প্রতি নিয়ত হিংসা ছড়িয়ে যাচ্ছে সমাজে। ইতিকণার সঙ্গে এমন ব্যবহারে মোজাফফর যখন রাগে উত্তপ্ত হয়ে নিজের বাবার উদ্দেশ্যে বলতে শোনা গেছে — “মোস্তাক যা কোরেছে, বোলেছে, তাতো শুধু ওর কথা নয়। ও অ্যাক শ্রেণির, মানে অ্যাকটা অংশের, প্রতিনিধিত্ব কোরছে বাপ!... সংখ্যালঘুর মনে যদি অ্যাকইসঙ্গে অবদমন ও অপ্রাপ্তির তবলা বাজে তাহলে অমনই হয়। ভয়ংকর রাগ ও ক্ষোভ জমে তার মনে। সেই রাগ ফুটন্ত লাভার মতো মাটির আড়ালে গর্জাতে থাকে। ফের যদি কখনও মাটি ফাটিয়ে সেই গরম লাভাস্রোত বাইরে আসে তো সেটা অমনই অনাছিষ্টি বাধায়।”^৮

উপন্যাসে মোস্তাক চরিত্রটি যেমন কিছু উগ্রপন্থীদের উপর বিশ্বাস করে নিজের জাতি উন্নতি করবে ভেবেও ভুল পথে পরিচালিত হয়। সেখানেই মোজাফফর চরিত্রটি লেখক এঁকেছেন একজন প্রগতিশীল মানবতাবাদী নাগরিক হিসেবে। যে নিজের ধর্মীয় পরিচয়কে পাশ কাটিয়ে দেশপ্রেমকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়েছে। আর সেই কারণেই, নিজে মুসলিম সম্প্রদায়ের হলেও, ভিন্ন ধর্মী ইতিকণাকে ভালোবাসতে দ্বিধাবোধ করে নি। তবে তাদের এই সম্পর্ক সমাজ কীভাবে গ্রহণ করবে, তাদের বিয়ে আদৌ কী সামাজ্যে স্বীকৃতি পাবে তা নিয়েও তারা অবশ্য নিরাপত্তীনতায় ভুগতে থাকে। সমাজের ভয়ে নিজের পছন্দের মানুষটিকে নিজের করে পেতে যে বাধা মোজাফফর ও ইতিকণাকে পেতে হচ্ছে সেটি বর্তমান সমাজের এটি একটি নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। লেখক এখানে সামাজিক সমস্যাকে পারিবারিক অঙ্গনে এনে উপস্থাপন করেছেন। ধর্মীয় আবেগকে কাজে লাগিয়ে কিছু উগ্রপন্থী মানুষকে প্রতিনিয়ত বিপথে পরিচালিত করছে যার ফাঁদে অশ্বের মতো পা দিয়ে ফেলে মোস্তাকের মতো অদম্য ধর্মভক্তি মানুষ, ব্যক্তিগত জীবন হোক বা সমাজসেবা সবকিছুতেই ধর্মকে সর্বোচ্চ স্থানে রাখতে চেয়েছে। তার মতে — “আমাদের হতে হবে প্রথমত মুসলমান, দ্বিতীয়ত মুসলমান, এবং তৃতীয়ত বাঙালি আর ভারতীয়।”^৯ আর এখানেই মোজাফফরের সঙ্গে মোস্তাকের দ্বন্দ্ব বাদে কারণ মোজাফফরের মতে — “আমার ঠিক উল্টো মনে হয়। আমাদের প্রত্যেককে হতে হবে প্রথমত বাঙালি, দ্বিতীয়ত ভারতীয় এবং তৃতীয়ত মুসলমান।”^{১০} মোজাফফর ধর্মের উর্ধ্বে গিয়ে নিজের জাতিগত পরিচয়কে মূল্য দিতে চেয়েছিল। মানুষের জীবনে পরিচয়ের প্রশ্নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো দেশ, কারণ দেশ আমাদের অস্তিত্বের মূল ভিত্তি ও সম্মিলিত পরিচয়। ধর্ম নিঃসন্দেহে মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও আত্মিক স্বাধীনতার প্রকাশ, কিন্তু তা কখনোই জাতীয় বা মানবিক পরিচয়ের উর্ধ্বে যেতে পারে না। যখন ধর্ম জাতিগত পরিচয়ের স্থান দখল করে নেয়, তখন সমাজে বিভাজন, বৈরিতা ও অরাজকতার জন্ম দেয়। উপন্যাসে এই ধর্মান্ধতার ভয়াবহ পরিণতিই সূক্ষ্মভাবে চিত্রিত হয়েছে, যা আমাদের মানবিক চেতনা ও জাতীয় সংহতির গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়।

উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, একই পরিবারের দুটি সন্তান হয়েও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মানসিকতা ও চরিত্রের মধ্যে গভীর বৈপরীত্য সৃষ্টি হয়। এটি স্বভাবতই একটি জটিল প্রক্রিয়া, যা একটি ছোটো পরিবারের অভ্যন্তরীণ গতিশীলতা ও বৃহত্তর সামাজিক বাস্তবতার প্রতিফলন। লেখক উপন্যাসে নদীর দুটি ভিন্ন গতিপথের রূপক ব্যবহারের মাধ্যমে এই পার্থক্য চিত্রায়িত করেছেন। নদীর যেমন দুটি শাখা একই উৎস থেকে উৎপন্ন হলেও ভিন্ন ভিন্ন পথে প্রবাহিত হয়ে পৃথক গন্তব্যে পৌঁছে গেছে তেমনি দুই ভাইয়ের জীবনযাত্রা চিন্তাধারা ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি অভিন্নমুখী হয়ে পড়ে তাদের জীবনের গতি ও গন্তব্য এক সময় আলাদা হয়ে পড়ে। পিতা

সওকত আলি এই ভাঙনের প্রেক্ষিতে একপ্রকার অসহায়ত্ব অনুভব করেন। বড়ো ভাই মোজাফফরের দৃষ্টিতে ছোটোভাই মোস্তাক উগ্রবাদী চিন্তাধারায় আকৃষ্ট হওয়া কেবল পারিবারিক সংকট নয়, বরং মুসলিম সমাজের নৈতিক মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক চেতনার জন্য অন্তর্নিহিত বিপদ। এই ধরনের মানসিকতা মুসলিম সমাজের সম্মান ও চিত্রের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। ভিন্নধর্মী মানুষ মধ্যে ইসলাম ও সন্ত্রাসের অসঙ্গতিপূর্ণ সংমিশ্রণ বোঝার ফলস্বরূপ সমাজে বিভ্রান্তি ও কলঙ্কের সৃষ্টি হচ্ছে। সামাজিক ও নৈতিক এই দ্বন্দ্ব ধীরে ধীরে ব্যক্তিগত সম্পর্কেও প্রতিফলিত হয়। দুই ভাইয়ের মধ্যে মতাদর্শগত বিরোধ প্রথমে মৌখিক সংঘাত তৈরি করলেও পরে এক সময় হাতাহাতির পর্যায়ে পৌঁছে যায়। দুই সন্তানের মধ্যে এই সংঘাত শান্ত, নিরীহ ও সরল স্বভাবের বাবা সওকত আলি ও মা মরিয়মের মনে গভীর মানসিক বিপর্যয়ে নামিয়ে আনে যা কেবল পারিবারিক সম্পর্কের ভাঙন নয়, বরং মানবিক সংবেদন ও সহনশীলতার অবক্ষয়ের প্রতীক হিসেবেও প্রতিভাত হয়। এক সময় স্ত্রীর মরিয়ামের প্রতি ইঞ্জিত করে সওকত আলি বলেন, দ্যাখো তোমার দুই নদী খর গতি নিয়ে আমার-তোমার পালতোলা নৌকাকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দ্যাখো।^{১৩৩} এই উপমা প্রকৃতপক্ষে পরিবারের ভাঙনের অবসান প্রক্রিয়াকে সময়ের প্রভাবে চিত্রায়িত করছে। উপসংহারে, উপন্যাসে ব্যক্তিগত ও সামাজিক দ্বন্দ্বের সংমিশ্রণ বিশেষভাবে উঠে আসে। সওকত আলি তার পরিবারের ভাঙনের দৃশ্যমান প্রক্রিয়ায় নিরুপায়তার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও, লেখক পাঠককে দেখান কীভাবে সামাজিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব এক পরিবারের অভ্যন্তরীণ সম্পর্কে গভীরভাবে প্রভাবিত করতে পারে। এটি একটি বিশ্লেষণধর্মী প্রতিফলন, যা কেবল পরিবারের মধ্যকার দ্বন্দ্ব নয়, বরং সমাজ ও ধর্মের সঙ্গে মানসিকতার সম্পর্কেও প্রকাশ করে।

আমরা উপন্যাসের যত শেষ পর্যায়ে পৌঁছই ততই বুঝতে পারি সওকত আলি কীভাবে সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়ে যায়। মোজাফফর ও ইতিকণার অসম প্রেম মেনে নিতে নারাজ সমাজ, নানার দিক থেকে বাধা এলেও শেষ পর্যন্ত তারা একে অপরের হাত ধরে তাদের সম্পর্কটা আঁকড়ে ধরে রেখেছেন। সমাজের ভয়ে মোজাফফরের মা তাদের এই বিয়েতে সম্মতি দেয়নি কিন্তু বাবা হিসেবে সওকত আলি প্রথম থেকে এই সম্পর্ক মেনে নিতে কোনো আপত্তি ছিল না তার বিশ্বাস ছিল মানুষ অনেক বড়ো সওকত আলি ধর্মীও বিশ্বাসকে পাশে রেখে সম্পর্ককে বেশি মর্যাদা দিয়েছিলেন। কিন্তু তাকেও এক সময় সমাজের কাছের পরাজিত হতে হয়েছে অসহায়ের মতো তাকে বলতে শোনা গেছে — “মুসলমানগুলোর সব মাথা মোটা তাই!... রাজনীতিতে, ভোটে, কালচারে-ধর্মে, সম্পত্তিতে-বসবাসে, সব জায়গায় ভাইয়ে-ভাইয়ে এই দ্বন্দ্ব-মারামারি... হচ্ছে পুতুলনাচের কারণে, আমরা সব কলের পুতুল, পেছন থেকে কারা য্যানো কল টিপে দিচ্ছে আর আমরা নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি কোরছি।”^{১৩৪} তার জীবনে তার স্বপ্ন সফল হলো না তার দুই ছেলে আজ দুই ভিন্ন পথে যাত্রী। সমাজের বিরুদ্ধে গিয়ে পরিবারের অমতে ইতিকণাকে আইনসম্মতভাবে বিয়ে করে ঘরে তুলেছিল মোজাফফর। কিন্তু সেই বিয়ে স্বাভাবিকভাবেই মেনে নেয়নি ইতিকণার পরিবার। নিজেদের ক্ষমতা সাম্প্রদায়িক ও রাজনীতির সাহায্যে পুলিশকে কাজে লাগিয়ে ইতিকণাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাই। উপরন্তু মোজাফফরের বিরুদ্ধে তাদের মেয়ে অপহরণের অভিযোগ করে থানায় FIR করে। অন্যদিকে লাল বাজার থেকে পুলিশ আসে মোস্তাকের খোঁজে। কে বা কারা মোস্তাকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে এবং সেই অভিযোগের উপর ভিত্তি করে পুলিশ জানতে পেরেছে ভারতবর্ষ জুড়ে যেসব নাশকতামূলক কাজ হচ্ছে মোস্তাকের সঙ্গে সেই দলের যোগাযোগ আছে। পুলিশ এসে সওকত আলির পুরো বাড়ি ঘেরাও করে মোস্তাকের সন্ধানে। রাষ্ট্র ও পুলিশের ভয়ে সওকত আলির দুই ছেলে আজ ঘরছাড়া। এসব দেখে সওকত আলির স্ত্রী মরিয়াম কান্নায় ভেঙে পড়ে। পুরো ঘটনাটি দেখে মোজাফফর হতচমকিত হয়ে যায়। সে বুঝতে পেরেছিল কোথাও গিয়ে তার এক মারাত্মক অন্যায় হয়ে গেছে। আসলে সে ইতিকণাকে ভালোবাসে তেমনি ভালোবাসে নিজের দেশকে মোজাফফরের কথা অনুযায়ী ভালোবাসা, ভাবনা ও ভারতবর্ষ ছাড়া সে ভিন্ন জগতের কথা ভাবতে পারে না। মোস্তাক যখন মোজাফফরের ইতিকণার বিয়েটি মুসলমান মতে না হওয়ায় বাধা সৃষ্টি করেছিল তখন এই চরম সংকটের মুহূর্ত সে তার কিছু শুবাকাঙ্ক্ষীদের কাছ থেকে এই সংকট থেকে বার হবার জন্য পরামর্শ চেয়েছিল। দু-একজন ব্যতীত অবশ্য কেউ তার পাশে দাঁড়াতে

রাজি হয়নি। শেষে দুই এক জন তাকে পরামর্শ দেয় এই সুযোগে মোজাফফর জেনো মোস্তাকের বিরুদ্ধে প্রশাসনের কাছে নালিশ জানায় আর এর ফলে এক ঢিলে দুই পাখি মারবে। মোজাফফর ও আবেগ বশে অভিযোগ করেছিল যার উপর ভিত্তি করে পুলিশ মোস্তাকে খুঁজতে তাদের বাড়ি এসেছিল এবং সেই মুহূর্তে সে বুঝতে বাকি থাকে না তার আবেগী সিদ্ধান্তে মোস্তাক এর জীবনে কী ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে। সে অনুভব করতে শুরু করে নিজের রাগ ও ক্ষোভের মুহূর্তে করা অভিযোগ কীভাবে মোস্তাক-সহ তাদের পুরো পরিবারের শান্তি ও মর্যাদাকে বিপন্ন করেছে। লেখক এই চরিত্রের মাধ্যমে দেখিয়েছেন, মানবজীবনের প্রতিটি সিদ্ধান্ত কেবল ব্যক্তিগত নয় বরং সেটি কীভাবে পারিবারিক আর সামাজিক পরিণতিও বহন করে। উপন্যাসে কেন্দ্রবিন্দু দুই ভাই এক বিপরীতমুখী আদর্শের কারণে দ্বন্দ্ব সংঘাতে জড়িয়ে দুজনেই আজ ঘর ছাড়া। আর দুই ছেলের কারণে বাবা-মা হিসেবে সওকত আলি ও মরিয়ম বড়ো অসহায়।

উপন্যাসের শুরু থেকেই সওকত আলির মুখে নদী ও ঝর্ণার প্রসঙ্গটি বারবার উঠে আসে। এই ‘নদী কেবল একটি প্রাকৃতিক উপাদান নয়, বরং এটি মানবজীবনের এক গভীর প্রতীকে পরিণত হয়েছে। নদী যেমন অবিরাম প্রবাহমান, তেমনি মানুষের জীবনও ক্রমাগত চলমান — কখনো শান্ত, কখনো উত্তাল। সওকত আলির এই নদীচিন্তা তার মানবিক ও ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন। তিনি বিশ্বাস করেন, নদীর জল যেমন হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবাইকে সমানভাবে সিক্ত করে, তেমনি জীবনের প্রবাহও সকল মানুষের জন্য সমান। নদী এখানে একতার, মানবতার ও চিরন্তন জীবনের প্রতীক। এই প্রসঙ্গে সোহারাব হোসেন বলেছেন — “সময়ের এই বিপন্নতাকে নভলেটের ফর্মে ধরার চেষ্টা কোরেছি। নভলেট পাহাড়ি নদীর মতো। বাহুল্যবর্জিত, শাখা-প্রশাখাহীন, খর কিংবা শান্ত, প্রকাশ্য অথবা লুপ্ত, গতি নিয়ে সে এগোয়। খাতে অবস্থান-করা নুড়ি কিংবা পাথরখণ্ডে ধাক্কা খেয়ে সে কখনও কুপিত হয়, কখনও ফণা তোলে। দৈবিসেবি নরম ধারায়ও বয়ে যায়। এবেঞ্জের অ্যাকটা সমাজের অন্তপ্রোতকে মূর্ত করার জন্য এই রীতিকেই উপযুক্ত মনে কোরেছি।”^{১৩}

ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান — এই দুই সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্ক এক গভীর, জটিল ও বহুমাত্রিক বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি। হাজার বছরের সহাবস্থান, পারস্পরিক বিনিময় ও সংস্কৃতির মেলবন্ধনে এ সম্পর্ক যেমন মানবিক সহমর্মিতা, সৌহার্দ্য ও বন্ধুত্বের উজ্জ্বল উদাহরণ সৃষ্টি করেছে, তেমনি ইতিহাসের নির্দিষ্ট পর্যায়ে রাজনৈতিক স্বার্থ, ভুল ব্যাখ্যা ও ধর্মীয় গোঁড়ামির কারণে তাতে দেখা দিয়েছে অবিশ্বাস, সংঘাত ও বিভেদের অশঙ্কার ছায়া। এই দুই সম্প্রদায়ের সম্পর্ককে একটি নির্দিষ্ট নকশা বা উপন্যাসে তার কাহিনি তুলে ধরা প্রায় অসম্ভব, কারণ এর অন্তরালে লুকিয়ে আছে সময়, সমাজ ও সংস্কৃতির অগণিত স্তর। ভারতীয় সমাজজীবনের দীর্ঘ পথ চলায় যেমন দাঙ্গা, হিংসা ও বিদ্বেষের অধ্যায় সত্য, তেমনি অস্বীকার করা যায় না একে অপরের প্রতি সহানুভূতি, মানবিকতা ও পারস্পরিক সহযোগিতার মর্মস্পর্শী দৃষ্টান্তগুলোকেও। এই দ্বৈততা — সংঘাত ও সম্প্রীতির সহাবস্থানই আসলে ভারতীয় সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, যা সাহিত্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রতিটি স্তরে গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১. ‘আলাপচারিতা’, তৌসিফ আহমেদ, ‘গল্প সরণি’ সোহারাব হোসেন বিশেষ সংখ্যা, ‘ত্রয়োবিংশতি বর্ষ: বার্ষিক সংকলন’ ১৪২৫ / ২০১৯, পৃ. ৪০৮
২. ‘বলার কথা’, সোহারাব হোসেন, ‘সওকত আলির প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি’, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, বইমেলা ২০০৯, পৃ. ৫
৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩১৪
৪. সোহারাব হোসেন, ‘সওকত আলির প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি’, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, বইমেলা ২০০৯, পৃ. ৯
৫. ওই, পৃ. ১২
৬. ওই, পৃ. ১৪
৭. ওই,

৮. ওই, পৃ. ১৭

৯. ওই, পৃ. ৪২

১০. ওই, পৃ. ৪১

১১. ওই, পৃ. ৪৯

১২. ওই, পৃ. ৮৬

১৩. 'বলার কথা', সোহারাব হোসেন, 'সওকত আলির প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি', মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, বইমেলা ২০০৯, পৃ. ৫

আকর গ্রন্থ:

১. সোহারাব হোসেন, 'সওকত আলির প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি', মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, বইমেলা ২০০০

সহায়ক পত্র-পত্রিকা:

১. লোকমান হাকিম (সম্পাদক), 'সত্যের দিশারী', বিশেষ সংখ্যা, বারাসাত, কলকাতা ১২৪ একাদশ বর্ষ, ২০০৯

২. এমদাদুল নূর হক (সম্পাদক), 'স্মারক ৫০শে পা-সোহারাব হোসেন', নতুন গতি, ৮৮ তালতলা লেন, কলকাতা ১৪, নভেম্বর, ২০১৫

৩. অমর দে (সম্পাদক), 'গল্পসরগি', বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা ২৮, ত্রয়োবিংশতি বর্ষ: বার্ষিক সংকলন ১৪২৫/২০১৯

লেখক পরিচিতি: লিসা পারভিন, গবেষক, বাংলা বিভাগ, সিকম স্কীলস ইউনিভার্সিটি, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ।